একাত্তরের যীশু: জেলেপাড়ার অনন্য গল্প

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আশ্রয় করে যেসব সিনেমা নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি সিনেমা 'একাত্তরের যীশু'। যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং সাধারণ নিরীহ মানুষের অসহায় অবস্থা, বেদনা ও ত্যাগের গল্প অসাধারণভাবে চিত্রিত হয়েছে এ চলচ্চিত্রে। মুক্তিযুদ্ধকে জানতে এখনো সমানভাবে সহায়ক নাসির উদ্দিন ইউসুফের 'একাত্তরের যীশু' সিনেমাটি। রঙ বেরঙ মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা নিয়ে নিয়মিত আয়োজন করে আসছে। বাঙালির শেকড় ও ঠিকানা হলো মুক্তিযুদ্ধ। প্রিয় পাঠক ***মৌ সন্ধ্যার*** *প্রতিবেদনে চলুন দেখে আসা যাক কেন মুক্তির এত বছর পরেও প্রাসঙ্গিক* ***'একাত্তরের যীশু'****।*

মুক্তির আলোয় 'একাত্তরের যীশু'

'একাত্তরের যীশু' সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৯৩ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক এই সিনেমাটি খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক শাহরিয়ার কবিরের লেখা একাত্তরের যীশু উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। পরিচালনা করেছেন নাসির উদ্দিন ইউসুফ। ১০০ মিনিট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রটির সংলাপ রচনা করেছিলেন সেলিম আল দীন। সংগীত পরিচালনা ও গীত রচনা করেছেন শিমুল ইউসুফ। চলচ্চিত্রটির প্রযোজক ছিলেন অনুপম চিত্রায়ন ট্রাস্ট।

যাদের অভিনয়ে প্রাণ পেয়েছে

'একাত্তরের যীশু' সিনেমায় প্রধান চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ুন ফরীদি, জহির উদ্দিন পিয়াল, আবুল খায়ের, আনওয়ার ফারুক, কামাল বায়েজীদ ও শহীদুজ্জামান সেলিম। এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইব্রাহিম বিদ্যুৎ, শতদল বড়ুয়া বিলু, সাইফুদ্দিন আহমেদ দুলাল, ফারুক আহমেদ, ইউসুফ খসরু, দেলোয়ার হোসেনসহ আরও অনেকে।

কী আছে 'একাত্তরের যীশু' সিনেমায়?

চলচ্চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ভূখণ্ডে মুক্তিযুদ্ধ চলছিল। গল্পটি এক জেলেপাড়া নিয়ে। তখনো যুদ্ধ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েনি। জেলেরা মাছ ধরে, তারপর হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। সে গ্রামে একটা চার্চও ছিল। গ্রামের বেশিরভাগ জেলেই খ্রিস্টান ধর্ম পালন করে। প্রতি রবিবার সকালে চার্চের কেয়ারটেকার ডেসমন্ড গির্জার ঘণ্টা বাজাতেন। তারপর গ্রামের সব মানুষ আসতেন সেই গির্জায়। ফাদার তাদেরকে বাইবেল থেকে যীশুর গল্প শোনাতেন। সবকিছুই চলছিল ঠিকঠাক। কিন্তু একদিন ওদের গ্রামেও যুদ্ধ এসে পড়লো। সেদিন জেলেরা হাটে গিয়ে বসে বসে মাছি মারছিল; কেউই আর মাছ কিনতে আসে না। হঠাৎ ওরা শোনে কারা যেন 'জয় বাংলা' বলে স্লোগান দিচ্ছে। আর তারপরই গুলির শব্দ। পাকবাহিনী আক্রমণ করেছে। জেলেরা যে যেদিকে পারলো পালাতে লাগলো। কিন্তু সবাই পালাতে পারলো না। ওদেরই একজন, হরিপদ পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে মারা গেল।

শহরে তখন যুদ্ধ চলছিল। দলে দলে লোক শহর ছেড়ে পালিয়ে ভারতে যেতে শুরু করেছে, যেখানে পাকবাহিনীর তাণ্ডব নেই। কেউ যাচ্ছে শুধুই আশ্রয়ের জন্য, আর কেউ ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে শত্রুকে ঘায়েল করবে, এজন্য। জেলেপাড়ার

‘একাত্তরের যীশু’ সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৯৩ সালে।

চলচ্চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ভূখণ্ডে মুক্তিযুদ্ধ চলছিল।

লন্ডন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১৯৯৪ সালে মনোনয়ন পায় এটি।

লোকগুলো দেখলো, দলে দলে মানুষ কেবল হাঁটছে আর হাঁটছেই। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। রাতে শোওয়ার জায়গা নেই। অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেই। লোকগুলো কেবলই হাঁটছে। কেউ মরে গেলে রাস্তার পাশে পড়ে থাকছে। যারা অসুস্থ তারাও হাঁটছে। জেলেপাড়ার মাস্টার সেখানকার সব লোককে জড়ো করলেন। আর তারপর শুরু করলেন এই শহরছাড়া মানুষগুলোর সেবা। রাতারাতি তাদের জন্য তৈরি করলেন কতোগুলো তাঁবু। গ্রামের সবার কাছ থেকে চাদর আর মাদুর নিয়ে সেখানে রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। বাড়ি বাড়ি থেকে চাল-ডাল নিয়ে সবার জন্য খিচুড়ি রান্না করা হলো। কিন্তু চিকিৎসার বন্দোবস্ত হলো না বলে মাস্টার গিয়ে গির্জার ফাদারকে বললেন, গির্জায় রাখা ওষুধ অসুস্থদের দিতে। আরও বললেন, সিস্টাররা যেন অসুস্থ মানুষগুলোর চিকিৎসার ভার নেয়। এতে করে আবার ফাদার পড়লেন আরেক চিন্তায়; গির্জাকে তিনি এই যুদ্ধের মধ্যে জড়াবেন কি না। কিন্তু ফাদার এতো মানুষের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সিস্টারদের অনুমতি দিলেন সবার চিকিৎসার ভার নেওয়ার জন্য। রাতভর মাস্টার, তার ছাত্ররা, বুড়ো ডেসমন্ড আর সিস্টাররা মিলে শহর ছেড়ে পালিয়ে আসা লোকদের সেবা করলেন, খাওয়ালেন, চিকিৎসা করলেন। পরদিন সকালে সব লোক আবার ভারতের পথে যাত্রা শুরু করলো। তাঁবুগুলো আবার ফাঁকা হয়ে গেলো।

কিন্তু চার্চের আশেপাশে ঘুরতে ঘুরতে ডেসমন্ড দেখেন একটা গাছের গোড়ায় একটা ফুটফুটে মেয়ে রয়ে গেছে সেই সব শরণার্থীদের মধ্যে থেকে। ডেসমন্ড ওর কাছে নাম, গ্রামের নাম জানতে চাইলে মেয়েটা কিছুই বলতে পারলো না। পরে ডেসমন্ড বুঝতে পারলেন, মেয়েটা বোবা! ডেসমন্ড এবার মেয়েটার পিছনে সময় দিতে লাগলেন। ওকে গল্প শোনান, যীশুর গল্প। পাতার বাঁশি বানিয়ে দেন, বাজিয়ে শোনান। আরেকদিন গ্রামে খবর এলো, হাটে পাকবাহিনী এসেছে। তারা হাট জ্বালিয়ে দিয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই গুলি করে মারছে। আরেক গ্রামের গির্জার ফাদারকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। শিশু-বৃদ্ধ, জোয়ান-বুড়ো, ফাদার-জেলে, কাউকে পাক বাহিনী ছাড়ছে না, সবাইকে মারছে। গ্রামের সব লোক ভয়ে পালাতে লাগলো। গির্জা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন স্বয়ং ফাদারও। কেবল থেকে গেলেন বুড়ো ডেসমন্ড আর ঐ ফুটফুটে মেয়েটা। ওদিকে এই জেলেপাড়াতেও পাকবাহিনী এসে পড়লো। ডেসমন্ড মেয়েটাকে বললেন ঘর থেকে না বের হতে। আর নিজে দেখতে গেলেন বাইরের অবস্থা। ওদিকে পাকবাহিনী এসে সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে করে মেরে ফেলতে লাগলো। ডেসমন্ড গ্রামে ফিরে দেখেন, পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে আর কিছু বাদ রাখেনি পাকবাহিনী। যতো বাড়ি ছিল, সব জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। যতো মানুষ ছিল সবাইকে মেরে রেখে গেছে। কেউ বেঁচে নেই। মেয়েদেরও ওরা মেরে ফেলেছে। লাশের স্তূপের মাঝে পড়ে রয়েছে সেই ফুটফুটে বোবা মেয়েটার লাশ। ডেসমন্ড মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ওকে কবর দিয়ে ছোট্ট ক্রুশ পুঁতে দিলেন ওর মাথার কাছে। এবার পৃথিবীতে একেবারেই একা হয়ে গেলেন ডেসমন্ড।

ওদিকে মাস্টার তো অনেক আগেই যুদ্ধে চলে গেছেন। তার বাহিনীর কয়েকটা ছোটো দলের থাকার জায়গা দরকার। মাস্টার ওদের একটা দলকে পাঠিয়ে দিলেন ডেসমন্ড কাকার কাছে। আর ডেসমন্ড কাকাও অনেক আগেই বুঝে গেছেন, এ যুদ্ধ সবারই যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কোনো রাজনৈতিক যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ তার জীবনের যুদ্ধ। সবাইকেই এখন কিছু না কিছু করতে হবে। ডেসমন্ড ওদেরকে আশ্রয় দিলেন। তিনি তখনো সেই গির্জার পাশে তার ছোট্ট ঘরে থাকেন। সেখানে ওদেরকেও থাকতে দিলেন। ওদের খাওয়ালেন, ওদের যত্ন নিলেন। আর ওরা এখান থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলো। কিছুদিন পরে একটা ছোটোখাটো অপারেশনে বের হলো ওরা। একটা পাকিস্তানি ক্যাম্পে আক্রমণ করতে হবে। খুব একটা বড় নয় ক্যাম্পটা। ওদের দলটাই যথেষ্ট অপারেশনটা করতে। ডেসমন্ড কাকার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে ওরা বের হয়ে গেলো। আর তারপর প্রচণ্ড যুদ্ধ করে হারিয়ে দিলো ক্যাম্পে থাকা পাক আর্মিদের। ওদের সবাইকেই মেরে ফেললো ওরা। এবার করা হবে একটা বড় অপারেশন। আশেপাশে পাকিস্তানিদের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প কমলগঞ্জে। ওরা এই ক্যাম্পটাই আক্রমণ করবে। পিছন দিক আর একপাশ থেকে আক্রমণ করবে দুইটা-দুইটা চারটা দল। আরেক পাশে থাকবে ওদের দলসহ তিনটা দল। আর সামনে থেকে আক্রমণে নেতৃত্ব দেবে মাস্টারের দলসহ তিনটা দল। মোট ১০টা দল মিলে সাঁড়াশি আক্রমণ করে ওরা দখল করে নেবে কমলগঞ্জের পাকিস্তানি ক্যাম্প। সব প্রস্তুতি নিয়ে ডেসমন্ড কাকার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়লো। কমলগঞ্জ ক্যাম্পে শুরু হলো যুদ্ধ। সে এক ভীষণ যুদ্ধ! ওখানে পাকিস্তানি বাহিনীর ডেরাও ভীষণ মজবুত, কোনোভাবেই দখল করা যাচ্ছে না। যদিও যুদ্ধে জয় হয় মুক্তিযোদ্ধাদের। তারপর সেখান থেকেই ক'জন মুক্তিযোদ্ধা খুশি মনে জয় নিয়ে ফিরছিল। পথিমধ্যে অন্ধকার জঙ্গলে পথে পাকবাহিনীর অ্যাম্বুশে পড়ে তারা। কোনো রকমে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় গির্জায়। সেখানে মারা যায় কেউ কেউ। যারা বেঁচে যায়, তাদের গুলি শেষ হয়ে যায়; কিন্তু পাকবাহিনীর সদস্যদের মারতে পারে না। অবশেষে তারা পাক আর্মির কাছে ধরা পড়ে।

গির্জার কেয়ারটেকার ডেসমন্ডকে সামনে পেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয় জানতে চায় পাক আর্মি। কিন্তু ডেসমন্ড নিজের প্রাণ বাঁচাতে অস্বীকার করেন মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিতি জানাতে। অথচ এদেরকেই লালন করেছেন তিনি এ ক'দিন। পাক আর্মি, গির্জার সামনে রাখা যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি দেখে অনুরূপভাবে পাক বাহিনী ক্রুশবিদ্ধ করে এই তিন মুক্তিযোদ্ধাদের মাঠের মধ্যে টানিয়ে দেয়। প্রচণ্ড বিষাদ নিয়ে কাঁদতে থাকেন ডেসমন্ড। তার কি করার কিছুই ছিল না?

যেখানে শুটিং হয়েছিল সিনেমার

‘একাত্তরের যীশু’ চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ করা হয় ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার নয়নশ্রী ইউনিয়নে অবস্থিত ‘ইছামতি’ নদীর পাশে, নবাবগঞ্জ উপজেলারই তুইতাল নামের একটি গ্রামে এবং নদীর পাশে অবস্থিত তুইতাল পবিত্র আত্মার গির্জায়।

সম্মাননা ও পুরস্কার

মুক্তির পরে ‘একাত্তরের যীশু’ সিনেমা পেয়েছিল বেশ কিছু সম্মাননা ও পুরস্কার। এই চলচ্চিত্রটির জন্য শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন নাট্যজন সেলিম আল দীন। লন্ডন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১৯৯৪ সালে মনোনয়ন পায় এটি। ১৯৯৩ সালে এটি গেছিল এডিনবার্গ (স্কটল্যান্ড) আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ১৯৯৪ সালে মনোনয়ন পায় ব্রিসবেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। যতই সময় গড়াবে এসব চলচ্চিত্রের কদর বাড়তেই থাকবে। কারণ শেকড়ের সন্ধান পাওয়া যায় এসব চলচ্চিত্রে।